

## ঝরছে পরীক্ষার্থী

গোড়ায় কি সুন্দর মিলে যাচ্ছিল সব। শেষটায় গিয়ে আবার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কোন হিসাবই যেন ঠিকঠাক মিলছে না আর। তাই সরে পড়ছে ওরা। প্রকৃতিত ফুলগুলো কেমন শুকিয়ে ঝরে পড়ছে ঘাসে, মাটিতে। বুকের আর ধরে রাখার উপায় নেই। সবার জন্য শিক্ষার আওতায় পড়া হয়ে উঠেছিল স্কুলগামী। বিনে পয়সায় বই, বিনা বেতনে শিক্ষালাভ, বৃত্তি প্রাপ্তি, কখনও বা টিফিন- সব মিলিয়ে সে এক সুনসান পরিস্থিতি বুঝি বিরাজ করছিল শিক্ষাঙ্গনে। অক্ষরজ্ঞান থেকে গ্রন্থভুবনে প্রবেশ করে ওরা জগত-জীবন চেনা ও জানার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত কিংবা বিনা ঝড়ে সবকিছু লডভড হয়ে যাওয়ার অবস্থাই আজ বিরাজমান। বিদ্যা অতি অমূল্য ধন হলেও শিশু-কিশোরদের জন্য ভারবাহী হয়ে ওঠায় তারা সেই ভার আর বইতে পারছে না। বইয়ের ভারে যেমন ন্যূনমান, তেমনই শ্রেণীকক্ষের অসমাপ্ত, অপূর্ণ পাঠদানে তাদের শিক্ষার দরজা পেরুনো দুক্লহ হয়ে ওঠায় কোটিং নামক বাণিজ্য পদ্ধতির করাল গ্রাস তাদের কেড়ে নিচ্ছে। স্বাভাবিক বিকাশের সব পথ বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসে। তোতা কাহিনীর

তোতার মতো বইয়ের পৃষ্ঠা গিলে গিলে তা পরীক্ষার হলে উগরে দেয়ার মতো কঠিন কঠোর কাজে সবাই পারে না মনোনিবেশ করতে। পরীক্ষা-ভীতিতে আক্রান্তরা জানে না কিভাবে এই ভীতি দূর করা যায়। তাই পড়াশোনার পাঠ চুকাতেই তাদের মনোযোগ গভীরতা পায়। যে শিশুটিকে স্কুলে ভর্তি হতেই কঠিন কঠোর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, আর এই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য অতি অল্প বয়সেও কোটিং নামক এক অসুস্থ ব্যবস্থার শিক্ষার হতে হয়। তখন সে শিশুটির মনোজগত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে আসে ক্ষীণ। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আর মুনাফা অর্জনের যে প্রতিযোগিতা, তার মাসুল গুনতে হয় শিশু-কিশোরদের। পরীক্ষা প্রথার নিরীক্ষার দাপটে জর্জরিত এরা, এদের ভুবনে সুকুমার বৃত্তির চর্চা বলে কিছু নেই। এরা তাই এক ধরনের পঙ্গুত্বকেই বরণ করে নিচ্ছে।

পরীক্ষার প্রতি তাই তাদের মনে যোরতর অনীহা এনে দিচ্ছে। এত কথার অবতারণা, চলমান জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এ পর্যন্ত চার লাখ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ না করার বিষয়টিকে সামনে রেখে। পরীক্ষায় অনুপস্থিত হওয়ার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। যা সংশয় শঙ্কা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কারণ অবশ্য।

সবার জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সমন্বিত সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়। এর ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমান না ভেবেই গোড়ায় বেশ বাহবা জুটেছিল। কিন্তু ক্রমাগত দেখা গেল শিক্ষার মানোন্নয়ন দূরের কথা, শিক্ষার প্রতি বিবমিষা তৈরি হচ্ছে। বরং কদিন পর দেখা গেল, আসলে কোটিং ব্যবসার রমরমা বাজার তৈরি ও সম্প্রসারণে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা বেশ 'টুপাইস' কামানোর পথ ও পন্থা তৈরি করেছে। তার ওপর পূর্ব প্রস্তুতি ও সার্বিক ব্যবস্থা তৈরি না করে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তা মূলত 'গাইড' বইয়ের ব্যবসাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। ২০১০ সালে চালু করা অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণের কারণ হিসাবে দেখানো হলো যে, ড্রাইভার, দারোয়ান পদে বা বিদেশে চাকরি পেতে অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট কাজে দেবে। সে জন্য এই পরীক্ষা। পরীক্ষা চালুর পর থেকে দেখা গেল, ঝরে পড়ার সংখ্যা বাড়ছে। পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করা হলেও কেন্দ্রে আর আসছে না তারা। যারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। তাদের ঝরে পড়ার আশঙ্কা প্রায় শতভাগ। প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা গেলেও কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আসার লক্ষণ মিলছে না। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ চালু রেখে যেমন মানসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ মিলবে না, তেমনই শিক্ষা ক্ষেত্রে নেরাজ্যের হার বাড়তেই থাকবে। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে আত্মপ্রসাদ লাভকারীরা বুঝতেও চায় না। সার্বিক পরিস্থিতির মতো অবনতি ঘটছে। তাই বলা হতো শিক্ষার হার বাড়ছে। মান বাড়ছে না। আর এখন তো হার ও মান দুটোই উচ্ছিন্নে যাওয়ার পথে। এ রাহুর দশা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি জরুরী।

শিক্ষার হার বাড়ছে।

মান বাড়ছে না।

আর এখন তো হার

ও মান দুটোই

উচ্ছিন্নে যাওয়ার

পথে। এ রাহুর দশা

থেকে শিক্ষার্থীদের

মুক্তি জরুরী